OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 539 - 548
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ভাষা : সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার চাবিকাঠি

রাহুল সরকার
জুনিওর রিসার্চ ফেলো, দর্শন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rs1823246@gmail.com
0009-0000-6126-8201

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Language, Culture, Globalisation, Relationship, Metaphor, Sapir-Whorf Hypothesis, Language proficiency, Bilinguals and multilinguals, Intercultural experiences.

Abstract
This study examines the intricate relationship between language and culture, positing that proficiency in a language enhances our comprehension of diverse cultures. Despite globalisation's role in bridging distances, it often fails to facilitate an understanding of the deeper cultural elements, such as values and social norms. The fundamental importance of cultural understanding resides in its capacity to dismantle stereotypes and prejudices. The paper contends that language transcends its function as a mere conduit for information exchange; it encapsulates cultural heritage and influences our worldview. By employing concepts such as the Sapir-Whorf hypothesis, the study illustrates the impact of language on our perception of reality. Through the lenses of anthropology, linguistics, and international relations, the paper demonstrates that language acquisition fosters a deeper understanding of other cultures. It addresses various communication styles and highlights how linguistic differences can lead to misunderstandings. Language is often regarded as a reflection of culture, suggesting that one can discern cultural characteristics through linguistic expression. Another metaphor frequently employed to illustrate the relationship between language and culture is that of an iceberg. In this analogy, the visible portion represents language, encompassing a small segment of culture, while the larger, submerged part signifies the hidden aspects of culture. These metaphors collectively convey the intricate interplay between language and culture. The paper concludes by emphasising the importance of preserving languages and promoting multilingualism for global harmony. It further explores the interconnection between culture and language, introducing novel metaphors to elucidate this relationship. The study asserts that language and culture are mutually dependent for their existence. Revitalising a language involves facilitating its evolution alongside its speakers. By comprehending a language, we gain insights into a people's history and mindset, thereby enhancing relatability. This paper argues that educational institutions should prioritise language learning as a fundamental aspect of fostering global citizenship. Such an approach will facilitate a deeper understanding of diverse cultures.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : মাতৃভাষার শিক্ষার্থীরা যখন নিজেদের সংস্কৃতিতে নিমগ্ন থাকে, তখন ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যকার সংযোগ নিয়ে প্রায়শই কোনো প্রশ্ন ওঠে না। বিদেশি ভাষা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রকৃত সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতা ও উপলব্ধি পাঠ্যপুস্তকের অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, সেখানে ভাষা সম্পর্কে ধারণা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদিও অনেকের মতে ভাষা ও সংস্কৃতিকে পৃথক করা সম্ভব, তবুও এই ধরনের পৃথকীকরণের বৈধতা এবং এর প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যোগাযোগের একটি জটিল ব্যবস্থা হিসেবে ভাষা কেবল তথ্য আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম হিসেবেই কাজ করে না, বরং এটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং সামাজিক কাঠামোর একটি মৌলিক ভান্ডার ও বাহক হিসেবেও কাজ করে। তাই, কোনো সংস্কৃতিকে গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য তার ভাষাগত সূক্ষ্মতাগুলো অন্বেষণ করা অপরিহার্য; কারণ এই সূক্ষ্মতাগুলোর মধ্যেই প্রায়শই এমন সব অনন্য ধারণাগত কাঠামো ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত থাকে, যা আমাদের কাছে অধরাই থেকে যেত। ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যকার এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি নির্দেশ করে যে, ভাষাগত দক্ষতা কেবল শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সেই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটগুলোরও এক নিবিড় ও সূক্ষ্ম উপলব্ধিকে ধারণ করে, যা অর্থের গঠন ও ব্যাখ্যার রূপরেখা নির্ধারণ করে। বর্তমান গবেষণাপত্রটি এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, ভাষা একটি গতিশীল মাধ্যম হিসেবে কাজ করে— যার মধ্য দিয়েই সাংস্কৃতিক সত্তা বা পরিচয় নির্মিত, সংরক্ষিত এবং পুনঃনির্ধারিত হয়; আর এভাবেই ভাষা মানব সমাজের জটিল বুননটিকে পাঠোদ্ধার করার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে তুলে ধরে। ফলস্বরূপ, রূপক, বাগধারা এবং আলোচনার ধরনের মতো ভাষাগত বিষয়াবলিকে বিশ্লেষণ করলে সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত রীতিনীতি এবং ঐতিহাসিক গতিপথগুলো উন্মোচিত হতে পারে, যা আমাদের সমষ্টিগত চেতনা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তাছাড়া, দ্বিতীয় ভাষা অর্জন প্রায়শই জ্ঞানীয় ক্ষমতাকে সহজ করে তোলে, যা শিক্ষার্থীদের বাস্তবতা অনুধাবন ও বিন্যস্ত করার বিকল্প উপায়গুলোর সাথে পরিচিত করানোর মাধ্যমে আন্তঃসাংস্কৃতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এই প্রক্রিয়াটি ব্যক্তিগত উপলব্ধির ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সমষ্টিগত বোঝাপড়া ও মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এই গবেষণাপত্রটি ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যকার বহুমাত্রিক সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করবে এবং অনুসন্ধান করবে কীভাবে ভাষাগত কাঠামোসমূহ কেবল সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিতই করে না, বরং সক্রিয়ভাবে তাকে রূপদানও করে। বিশেষত, এটি সেই কার্যপ্রণালীগুলো পরীক্ষা করবে যার মাধ্যমে ভাষাগত আপেক্ষিকতা জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে এই প্রক্রিয়াগুলো, ফলস্বরূপ, স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক দৃষ্টান্তগুলোকে শক্তিশালী করে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই পরস্পর জড়িত সম্পর্কগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা করা হবে এবং এই দাবিকে সমর্থন করার জন্য গবেষণালব্ধ প্রমাণ ও তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করা হবে, যে ভাষা সত্যিই গভীর সাংস্কৃতিক উপলব্ধির দ্বার উন্মোচনের এক অপরিহার্য চাবিকাঠি।

সংস্কৃতি ও ভাষার অবিচ্ছেদ্যতা : ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্কটি অত্যন্ত জটিল; এর আংশিক কারণ হল— মানুষ যখন একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে, তখন তাদের জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াগুলো অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। ভাষা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বহুবিস্তৃত গবেষণার একটি প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে; আর এই গবেষণাসমূহ থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, ভাষার ব্যবস্থাসমূহ কেবল কতগুলো যদৃচ্ছ প্রতীক মাত্র নয়, বরং একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক বুননের গভীরে এগুলি ওতপ্রোতভাবে প্রোথিত।

এই অন্তর্নিহিত সংযোগের অর্থ হল ভাষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সাংস্কৃতিক জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চালনের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্কটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, ভাষাগত কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক চর্চা কীভাবে একে অপরের সাথে সহ-বিবর্তিত হয় এবং একটি নিরবচ্ছিন্ন পারস্পরিক প্রভাবচক্রের মাধ্যমে একে অপরকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের সহ-বিবর্তন যেভাবে প্রকাশিত হয় তা হল— একটি ভাষার ব্যাকরণগত বর্গ এবং শব্দার্থগত বিভাজনগুলো প্রায়শই সেই ভাষার বক্তাদের অগ্রাধিকারসমূহ এবং পরিবেশগত অভিযোজনগুলোকে প্রতিফলিত করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এটি সর্বজনস্বীকৃত যে ভাষা সংস্কৃতিরই একটি অংশ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, ভাষা ছাড়া সংস্কৃতির অস্তিত্বই সম্ভব হত না। ভাষা একই সাথে সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে এবং সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ও রূপায়িত হয়। ব্যাপকতর অর্থে, ভাষা কোনো একটি জনগোষ্ঠীর প্রতীকী উপস্থাপনাও বটে; কারণ এর মধ্যে তাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি— তথা জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের জীবনযাপন ও চিন্তাধারা—অন্তর্নিহিত থাকে। এই দুইয়ের সম্পর্ককে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়— 'ভাষা সংস্কৃতির একটি অংশ এবং সংস্কৃতি ভাষার একটি অংশ; এই দুই উপাদান এতটাই নিবিড়ভাবে একে অপরের সাথে জড়িত যে, ভাষা কিংবা সংস্কৃতি— উভয়ের কোনোটিরই তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ না করে এদের একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।' এক কথায় বলতে গেলে, সংস্কৃতি ও ভাষা অবিচ্ছেদ্য।

ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক রূপকসমূহ : কেউ কেউ বলেন যে, ভাষা হল সংস্কৃতির দর্পণ— এই অর্থে যে, মানুষ কোনো সংস্কৃতির ভাষাকে মাধ্যম করেই সেই সংস্কৃতিকে অবলোকন করতে পারে। ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রতীকায়িত করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত আরেকটি রূপক হল 'হিমশৈল'। এর দৃশ্যমান অংশটি হল ভাষা— যার সাথে সংস্কৃতির অতি সামান্য একটি অংশও যুক্ত থাকে; পক্ষান্তরে, এর যে বিশাল অংশটি জলপৃষ্ঠের নিচে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তা-ই হল সংস্কৃতির অদৃশ্য দিক। (Jiang, The Relationship between Culture and Language, 2000, p. 328-329) ভাষা ও সংস্কৃতি র সম্পর্ক নিম্নোক্ত তিনটি অভিনব রূপকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ : ভাষা + সংস্কৃতি = একটি জীবন্ত সত্তা। ভাষা ও সংস্কৃতি মিলে একটি জীবন্ত সত্তা গঠন করে; ভাষা হল এর দেহ, আর সংস্কৃতি হল এর রক্ত। সংস্কৃতি ছাড়া ভাষা হল মৃত; আর ভাষা ছাড়া সংস্কৃতির কোনো রূপই থাকত না।

যোগাযোগের দৃষ্টিকোণ : যোগাযোগ হল সাঁতার কাটা, ভাষা হল সাঁতার কাটার দক্ষতা এবং সংস্কৃতি হল জল। ভাষা ছাড়া যোগাযোগ অত্যন্ত সীমিত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকত; আর সংস্কৃতি ছাড়া যোগাযোগের কোনো অস্তিত্বই থাকত না।

বাস্তবসম্মত দৃষ্টিকোণ : যোগাযোগ অনেকটা পরিবহনের মতোই ভাষা হল এর বাহন এবং সংস্কৃতি হল ট্রাফিক বাতি। ভাষা যোগাযোগকে সহজ ও দ্রুততর করে তোলে; অন্যদিকে সংস্কৃতি যোগাযোগকে নিয়ন্ত্রণ করে— কখনো তা যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করে, আবার কখনো তাতে বাধা সৃষ্টি করে। এককথায়, ভাষা ও সংস্কৃতি—যদিও তারা একে অপরের চেয়ে ভিন্ন— তবুও তারা সম্মিলিতভাবে একটি অখণ্ড সত্তা গঠন করে।

অন্যভাবে, আমরা যদি সমাজকে একটি সুইমিং পুলের সাথে তুলনা করি, তবে ভাষা হল সাঁতার কাটার দক্ষতা এবং সংস্কৃতি হল সেই জল। যখন এই উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তখন মানুষ ভালোভাবে সাঁতার কাটে অর্থাৎ সফলভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে। তারা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে ও দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটে যখন তারা জলের সাথে পরিচিত থাকে অর্থাৎ নিজেদের মাতৃ-সংস্কৃতির গণ্ডির মধ্যে থাকে; কিন্তু যখন জল তাদের কাছে অপরিচিত হয় অর্থাৎ কোনো ভিন্ন বা বিদেশি সংস্কৃতির মধ্যে থাকে, তখন তারা সতর্কতার সাথে ও ধীরগতিতে সাঁতার কাটে।

সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার গুরুত্ব : আমাদের এই ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে, সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এখন আর কেবল একটি 'Soft Skill' নয়; বরং এটি বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সাফল্য এবং সামাজিক সম্প্রীতির জন্য একটি মৌলিক অপরিহার্যতা। এর অর্থ হল— কেবল নিছক সহনশীলতার গণ্ডি পেরিয়ে, সেইসব বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও রীতিনীতির প্রতি সক্রিয় কদর প্রদর্শন করা —যা মানুষের বিশ্বকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপদান করে।

সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার মূল তাৎপর্য নিহিত রয়েছে গতানুগতিক ধারণা ও কুসংস্কার ভেঙে ফেলার সক্ষমতার মধ্যে। অধিকাংশ সংঘাতেরই মূলে থাকে 'অপরের প্রতি ভীতি' —যা মূলত অজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয়। (Barker, Cultural Studies, theory and Practice, 2003, p. 37) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে আমরা সন্দেহের স্থানটিতে সহমর্মিতাকে প্রতিস্থাপন করি। এর ফলে এমন একটি নিরাপদ পরিবেশ গড়ে ওঠে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেখানে বিচিত্র সব গোষ্ঠী একে অপরের উদ্দেশ্য ভুল বোঝার কারণে সৃষ্ট কোনো সংঘাত ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে।

সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া মানে এই নয় যে, প্রতিটি রীতির সাথেই একমত হতে হবে; বরং এর অর্থ হল— পারস্পরিক ঐক্যের ভিত্তি খুঁজে পেতে ওইসব রীতির নেপথ্যে নিহিত মানবিক অভিজ্ঞতাসমূহকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই সেতুবন্ধন ছাড়া, বিশ্বজগৎ কেবল বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তাসমূহের এক সমষ্টি হয়েই থেকে যায়। আর এই সেতুবন্ধন গড়ে উঠলে, আমরা বৈশ্বিক বৈচিত্র্যকে বিভেদের উৎস থেকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মিলিত শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি।

ভাষা ও সংস্কৃতির তাত্ত্বিক কাঠামোসমূহ : Sapir-Whorf অনুকল্প— যা 'ভাষাগত আপেক্ষিকতা' নামেও পরিচিত— এটি হল এমন একটি উদ্দীপক তত্ত্ব, যা দাবি করে যে, আপনি যে ভাষায় কথা বলেন, তা কেবল আপনার চিন্তাভাবনাকেই প্রকাশ করে না; বরং এটি প্রকৃতপক্ষে আপনার চিন্তার ধরন এবং জগতকে আপনি কীভাবে প্রত্যক্ষ করেন—তাও গঠন বা রূপদান করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে Edward Sapir এবং তাঁর ছাত্র Benjamin Lee Whorf কর্তৃক প্রণীত এই অনুকল্পটি প্রস্তাব করে যে, ভাষা একটি 'ছাঁকনি' বা 'লেন্স' হিসেবে কাজ করে, যার মধ্য দিয়েই আমরা বাস্তবতাকে অনুধাবন বা প্রক্রিয়াজাত করে থাকি। (Campbell, The Sapir Whorf Hypothesis, 2017, p. 96) এই তত্ত্বটিকে সাধারণত 'শক্তির' দুটি স্তরে বিভক্ত করা হয়—

ভাষাগত নির্ধারণবাদ (শক্তিশালী সংস্করণ) : এই মতবাদটি দাবি করে যে, ভাষাই চিন্তাকে নির্ধারণ করে। যদি আপনার ভাষায় কোনো নির্দিষ্ট ধারণার, যেমন— কোনো বিশেষ রঙ বা সময়ের বোধ এর জন্য কোনো শব্দ না থাকে, তবে আপনি আক্ষরিক অর্থেই সেই ধারণাটি মনে মনে কল্পনা করতে বা বুঝতে অক্ষম হন। অধিকাংশ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীই এই সংস্করণটিকে অত্যধিক চরমপন্থী বলে মনে করেন।

ভাষাগত আপেক্ষিকতাবাদ (দুর্বল সংস্করণ) : এটিই অধিকতর ব্যাপকভাবে স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। এটি নির্দেশ করে যে, ভাষা চিন্তাকে প্রভাবিত করে। আপনার মাতৃভাষা নির্দিষ্ট কিছু চিন্তাপদ্ধতিকে অধিকতর 'অভ্যাসগত' বা সহজতর করে তোলে; কিন্তু এটি এমন কোনো মানসিক প্রতিবন্ধকতা বা দেয়াল তৈরি করে না, যা আপনাকে নতুন নতুন ধারণা আয়ত্ত করা থেকে বিরত রাখে।

যদিও আমরা জানি যে মানুষ ভাষা ছাড়াই চিন্তা করতে পারে যেমন, শিশুরা ও প্রাণীরা প্রতিনিয়ত তা করে থাকে, তবুও 'sapir-whorf hypothesis' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই রয়ে গেছে। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে— যখন কোনো ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন আমরা কেবল কিছু শব্দই হারাই না; বরং অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গিকেই হারিয়ে ফেলি।

Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf এর সাথে তাঁর গবেষণাকালে, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যকার নিবিড় সম্পর্কটি অনুধাবন করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে— "একটি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে অপরটি বোঝা বা যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।" (Wardhaugh, An introduction to sociolinguistics, 2002, p. 220) তবে, Wardhaugh উল্লেখ করেছেন যে, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যকার এই সম্পর্কটি নিয়ে মূলত তিনটি প্রধান দাবি বা মতবাদ প্রচলিত রয়েছে— (১) কোনো ভাষার গঠনশৈলীই নির্ধারণ করে দেয় যে, সেই ভাষার বক্তারা বিশ্বজগতকে কীভাবে অবলোকন করবেন; অথবা (২) অপেক্ষাকৃত মৃদু একটি মতবাদ অনুযায়ী ভাষার গঠনশৈলী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে সরাসরি নির্ধারণ না করলেও, বক্তাদের একটি নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (৩) কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি তাদের ব্যবহৃত ভাষার মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে: যেহেতু তারা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে গুরুত্ব দেয় এবং কাজগুলো একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে, তাই তারা তাদের ভাষাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে শেখে— যা তাদের মূল্যবোধ ও কর্মপদ্ধতিকেই মূর্ত করে তোলে। তথ্য আদান-প্রদান ও উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবে ভাষার ব্যবহারের বিষয়টি এমন একটি সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ভাষার বক্তা এবং শ্রোতা — উভয়েই এক বা একাধিক ভূমিকা পালন করে থাকেন। যোগাযোগের এই প্রক্রিয়াটিকে যখন এর অতি-প্রাথমিক বা ন্যূনতম রূপটিতে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থাৎ তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হয়, তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত কঠিন যে, সংস্কৃতি এই পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ওপর — এমনকি অতি ক্ষুদ্র পরিসরেও—কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার করে না।

সমাজ ভাষাবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট : সমাজভাষাবিজ্ঞান হল ভাষা ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের অধ্যয়ন। ভাষাবিজ্ঞান যেখানে প্রায়শই ভাষার 'যান্ত্রিক দিকগুলোর' যেমন ব্যাকরণ ও বাক্যতত্ত্ব এর ওপর আলোকপাত করে, সেখানে সমাজভাষাবিজ্ঞান মূলত প্রেক্ষাপটের ওপর গুরুত্বারোপ করে— অর্থাৎ কে কথা বলছেন, কার সাথে বলছেন, কোন পরিবেশে বলছেন এবং কী উদ্দেশ্যে বলছেন।

এর মূল কথা হল ভাষা কোনো স্থির নিয়মাবলির সমষ্টি নয়, বরং এটি একটি গতিশীল সামাজিক আচরণ, যা সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা রূপ লাভ করে। সংস্কৃতি ও ভাষা কীভাবে একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তা বোঝার জন্য, সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা বেশ কিছু নির্ণায়ক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন—

ভাষার বৈচিত্র্য (উপভাষা ও উচ্চারণভঙ্গি) : সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রায়শই আমাদের কথা বলার ধরন বা কণ্ঠস্বরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। আঞ্চলিক উপভাষা এবং উচ্চারণভঙ্গিগুলো কোনো ভাষার 'ভুল' সংস্করণ নয়; বরং এগুলো হলো ঐতিহ্য এবং আপন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির পরিচায়ক।

সামাজিক চলকসমূহ : শ্রেণি, লিঙ্গ, বয়স এবং জাতিসত্তার মতো উপাদানগুলো কথা বলার ধরনকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, 'Genderlect' বিষয়ক গবেষণায় এটি অনুসন্ধান করা হয় যে, বিভিন্ন সংস্কৃতি কীভাবে নারী ও পুরুষদের ভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করার জন্য সামাজিকীকরণ করে যেমন— সম্পর্ক-নির্ভর আলাপ বা 'rapport-talk' বনাম তথ্য-নির্ভর আলাপ বা 'report-talk'. (David, The Relationship between Language and Culture, 2013, p. 12)

রেজিস্টার ও শৈলী : এটি হল আমাদের কথা বলার 'সামাজিক মাত্রা' বা 'social volume'। আমরা কোনো সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিক বা গম্ভীর শৈলী ব্যবহার করি, আবার কোনো ফুটবল খেলার মাঠে ব্যবহার করি অনানুষ্ঠানিক বা ঘরোয়া শৈলী। এই ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ বা প্রেক্ষাপটে ঠিক কী ধরনের ভাষা ব্যবহার করাকে 'উপযুক্ত' বলে গণ্য করা হবে, তা মূলত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

কোড-সুইচিং : এটি হল সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক ভাষা কিংবা উপভাষার মধ্যে অদলবদল বা পরিবর্তন করার একটি চর্চা। দ্বিভাষী ব্যক্তিরা প্রায়শই এই কৌশলটি ব্যবহার করেন নিজেদের গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করতে কিংবা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বা মর্যাদাক্রমের সাথে মানিয়ে নিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ভাষা ব্যবহারের জন্য একটি 'অলিখিত নির্দেশিকা' প্রদান করে। এটি ছাড়া, আক্ষরিক অনুবাদ প্রায়শই ব্যর্থ হয়। উচ্চ-প্রসঙ্গ সংস্কৃতিতে যেমন, জাপান, আরব দেশসমূহ, সুস্পষ্ট শব্দের পরিবর্তে অঙ্গভঙ্গি এবং যৌথ ইতিহাসের মাধ্যমে অর্থের অধিকাংশই প্রকাশ পায়। (Phillipson, Linguistic Imperialism, 1993, p. 2-3) আবার নিম্ন-প্রসঙ্গ সংস্কৃতিতে যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যোগাযোগ সরাসরি এবং আক্ষরিক হবে বলে আশা করা হয়।

সৌজন্য এবং সম্মানসূচক শব্দ : কোরিয়ান বা থাই ভাষার মতো অনেক ভাষার ব্যাকরণে সম্মানসূচক শব্দের জটিল ব্যবস্থা অন্তর্নির্মিত রয়েছে। এগুলো সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধার উপর সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে, যা ইংরেজিতে ততটা দৃশ্যমান নয়।

নিষিদ্ধ বিষয় এবং সুভাষণ : একটি সংস্কৃতি যা বলতে অস্বীকার করে, তা সে যা বলে তার মতোই তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজভাষাবিদগণ অধ্যয়ন করেন কীভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতি মৃত্যু, যৌনতা বা অর্থের মতো 'নিষিদ্ধ' বিষয়গুলো সামলাতে সুভাষণ ব্যবহার করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমাজ ভাষাবিজ্ঞান প্রমাণ করে যে ভাষাই সংস্কৃতির সামাজিক বন্ধন। এটি অধ্যয়নের মাধ্যমে, অন্যরা কীভাবে তাদের জগতে বিচরণ করে সে সম্পর্কে আমরা গভীরতর সহানুভূতি লাভ করি, যা সামাজিক ও পেশাগত সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ানো 'সাংস্কৃতিক সংবেদনহীনতা' প্রতিরোধে সহায়তা করে।

বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ভাষা—বাধা ও সেতু : যখন ভিন্ন ভিন্ন পটভূমির মানুষ একে অপরের সাথে মতবিনিময় করেন, তখন তাঁরা কেবল কথার আদান-প্রদানই করেন না; বরং তাঁরা মূলত দুই ভিন্ন ধারার 'অলিখিত নিয়মাবলির' মধ্য দিয়ে পথ চলেন। ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে যোগাযোগের বিভ্রাট খুব কমই ঘটে শব্দভাণ্ডারের স্বল্পতার কারণে; বরং এমনটি ঘটে মূলত যোগাযোগের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক যুক্তির ভিন্নতার কারণে। কোনো একটি সংস্কৃতিতে যা 'সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান' হিসেবে বিবেচিত হয়, অন্য কোনো সংস্কৃতিতে তা-ই বিভ্রান্তিকর, আক্রমণাত্মক কিংবা এমনকি অসাধু আচরণ হিসেবেও প্রতীয়মান হতে পারে (Stern, Fundamental Concepts of Language Teaching, 2009, p. 119)।

প্রত্যক্ষতার ব্যবধান (উচ্চ-প্রসঙ্গ বনাম নিম্ন-প্রসঙ্গ) পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির সবচেয়ে সাধারণ উৎস। নিম্ন-প্রসঙ্গ সংস্কৃতি যেমন— যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইসরায়েল, এরা স্বচ্ছতা এবং 'সরাসরি মূল কথায় আসা'-কে গুরুত্ব দেয়। এদের কাছে 'না' মানেই 'না'।

উচ্চ-প্রসঙ্গ সংস্কৃতি যেমন— জাপান, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, এরা সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং 'সম্মান রক্ষা করা'-কে গুরুত্ব দেয়। এদের ক্ষেত্রে 'না' কথাটি হয়তো এভাবে প্রকাশ করা হয়— 'বিষয়টি হয়তো কঠিন হতে পারে' কিংবা 'আমি ভেবে দেখব'।

ফলস্বরুপ, একজন জার্মান ব্যবস্থাপক হয়তো তার জাপানি কর্মীকে 'অস্পষ্টভাষী' হিসেবে দেখতে পারেন; অন্যদিকে, সেই জাপানি কর্মী হয়তো জার্মান ব্যবস্থাপককে 'কঠোর' কিংবা 'রূঢ়' হিসেবে গণ্য করতে পারেন।

আবার, একজন সুশৃঙ্খল পেশাজীবী হয়তো তার 'প্রবাহমান' বা নমনীয় সহকর্মীর আচরণে অসম্মানিত বোধ করতে পারেন; অন্যদিকে, সেই নমনীয় সহকর্মী হয়তো রৈখিক পেশাজীবীটিকে 'ভাবলেশহীন' কিংবা 'মানুষের চেয়ে সময়সূচি নিয়ে বেশি আচ্ছন্ন' বলে মনে করতে পারেন।

আবার, পশ্চিমা সংস্কৃতিতে, চোখের দিকে সরাসরি তাকানো সততার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু অনেক এশীয় ও আফ্রিকান সংস্কৃতিতে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির চোখের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকাটা অবাধ্যতা কিংবা আক্রমণাত্মক আচরণের লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

আবার, দক্ষিণ আমেরিকায় কথোপকথনের সময় যে দূরত্বকে 'স্বস্তিদায়ক' মনে করা হয়, উত্তর ইউরোপে সেই দূরত্ব সাধারণত অনেক বেশি হয়ে থাকে। যদি একজন ব্যক্তি বারবার পিছিয়ে যেতে থাকেন আর অন্যজন বারবার এগিয়ে আসতে থাকেন, তবে কথোপকথন শেষে উভয়েই এক ধরণের অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

পাশ্চাত্য কথোপকথন-শৈলীতে, নীরবতাকে একটি 'শূন্যস্থান' হিসেবে দেখা হয়, যা পূরণ করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, অনেক নর্ডিক ও পূর্ব এশীয় সংস্কৃতিতে নীরবতা হল একটি 'সেতু' — যা মূলত আত্মচিন্তা বা মননের একটি মুহূর্ত। যখন কোনো এক পক্ষ অন্য পক্ষের 'চিন্তার নীরবতা'-র মাঝেই কথা বলে ওঠে, যার ফলে অপর পক্ষ নিজেকে রুদ্ধবাক বা উপেক্ষিত বোধ করে, তখনই পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। উপরক্ত সমস্যা থাকা সত্তেও ভাষা এবং সংস্কৃতি এর মেলবন্ধন সম্ভব।

এক্ষেত্রে আমাদের, দ্বিভাষিক এবং দ্বিসংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের সচেতানতা প্রয়োজন। যদিও এই দুটি বিষয় প্রায়শই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে পাশাপাশি চলে, তবুও দ্বিভাষিকতা এবং দ্বিসংস্কৃতি— উভয়ই অস্তিত্বের স্বতন্ত্র দুটি অবস্থা। একজন ব্যক্তি দুটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারলেও, সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলোর সাথে জড়িত সংস্কৃতিগুলোর সাথে নিজেকে একাত্ম নাও করতে পারেন; ঠিক একইভাবে, একজন ব্যক্তি কেবল একটি ভাষায়ই দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও দুটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে পারেন। তবে, লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয় একে অপরের সাথে মিশে গিয়ে এক অনন্য ও সংকর পরিচয়ের জন্ম দেয়। (Tomilson, Globalisation and Culture, 1999, p. 98)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দ্বিভাষিকতা হল দুটি ভাষা ব্যবহারের সক্ষমতা। আধুনিক গবেষণায় সেই পুরনো ভ্রান্ত ধারণাটি খণ্ডন করা হয়েছে যে, দুটি ভাষা শেখা মস্তিষ্কে 'বিভ্রান্তি' সৃষ্টি করে। বরং, এটি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো ও প্রদান করে—

দ্বিতীয় সত্তা : অনেক দ্বিভাষীই এমন অনুভূতি ব্যক্ত করেন যে, তারা যে ভাষায় কথা বলছেন তার ওপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন ব্যক্তি হিসেবে অনুভব করেন। এর মূল কারণ হল - প্রতিটি ভাষাই ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ এবং সামাজিক রীতিনীতিকে জাগ্রত করে।

দ্বি-সংস্কৃতিবাদ হল দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বিচরণ করার এবং সেগুলোর সাথে নিজেকে একাত্ম করার একটি কার্যকরী সক্ষমতা। ভাষা প্রায়শই সেই 'চাবি' হিসেবে কাজ করে, যা কোনো সংস্কৃতির দ্বার উন্মোচন করে। ভাষার অনুপস্থিতিতে, একজন ব্যক্তি নিজেকে সেই সংস্কৃতির একজন পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণকারীর পরিবর্তে কেবল একটি 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের' অংশ হিসেবেই অনুভব করতে পারেন।

এই বিশ্বায়িত পৃথিবীতে, দ্বিভাষিক ও দ্বিসংস্কৃতির অধিকারী ব্যক্তিরাই হয়ে ওঠেন মানব-সেতুবন্ধনের প্রকৃত মাধ্যম। তাঁরা কেবল শব্দের অনুবাদই করেন না, বরং দৃষ্টিভঙ্গিরও অনুবাদ করেন; আর ঠিক এ কারণেই আন্তর্জাতিক কূটনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামাজিক সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা অপরিহার্য। (Nida, Language and Translation, 1998, p. 29-30)

কোনো ভাষা শেখা মানেই হল দৃষ্টিভঙ্গিতে এক আমূল পরিবর্তন আসা। পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রায়শই ভাষার কেবল 'ব্যবহারিক উপযোগিতার' ওপর আলোকপাত করলেও, ভাষা অর্জনের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে এর সাংস্কৃতিক সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার সক্ষমতার মধ্যে— যা হল ভিন্ন পটভূমির মানুষের অনুভূতিগুলো বোঝা এবং তাদের সেই অনুভূতির অংশীদার হওয়ার ক্ষমতা।

আপনি যখন কোনো নতুন ভাষা শিখতে শুরু করেন, তখন প্রাথমিকভাবে আপনি সবকিছুকেই আপনার মাতৃভাষায় অনুবাদ করে নেন। তবে শেখার পথে আপনি যখন এগিয়ে যান, তখন আপনি 'ত্রিভুজায়ন' পদ্ধতিটি অবলম্বন করতে শুরু করেন। আপনি বুঝতে পারেন যে, আপনার শেখা নতুন ভাষার কোনো নির্দিষ্ট শব্দের হুবহু কোনো প্রতিশব্দ আপনার নিজের ভাষায় নেই; কারণ সেই শব্দটি এমন একটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ধারণ করে, যা নিয়ে আপনি আগে কখনো চিন্তাভাবনা করেননি।

উদাহরণস্বরূপ, জার্মান শব্দ 'Schadenfreude' (অন্যের দুর্দশায় আনন্দ পাওয়া) কিংবা জাপানি শব্দ 'Gaman' (অসহনীয় বলে মনে হওয়া পরিস্থিতিকে ধৈর্যের সাথে সহ্য করে নেওয়া) —এই শব্দগুলো শেখার মধ্য দিয়ে আপনি এমন কিছু মানসিক অবস্থাকে চিনতে বাধ্য হন, আপনার নিজের সংস্কৃতি হয়তো সেগুলোকে এত সুনির্দিষ্টভাবে কোনো নাম বা আখ্যা দেয়নি।

আমরা বলতে পারি যে, ভাষা শিক্ষা হলো মূলত 'অন্যের অবস্থানে দাঁড়িয়ে জগতকে দেখার' এক চূড়ান্ত প্রয়াস। এটি অপর ব্যক্তিকে এই বার্তা দেয় যে— 'আমি তোমার জগতকে এতটাই গুরুত্ব দিই যে, সেই জগতের ভেতরেই তোমার সাথে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে আমি কঠোর পরিশ্রম করতেও প্রস্তুত।' কেবল এই একটি প্রচেষ্টাই বহু দশকের কুসংস্কার ও অনাস্থার প্রাচীর ভেঙে ফেলার জন্য প্রায়শই যথেষ্ট হয়ে ওঠে।

এইভাবে, ভাষার পুনরুজ্জীবন মানে ভাষাকে পরিবর্তন থেকে রক্ষা করা নয়; বরং এর অর্থ হল— ভাষাকে এমন সব হাতিয়ার বা উপকরণ প্রদান করা, যার সাহায্যে তা তার জনগোষ্ঠীর সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হতে পারে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা কেবল যোগাযোগের একটি মাধ্যম নয়; এটি হল একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সহস্রাব্দ-প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কাঠামোর আধার — যা 'আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থা' (IKS) নামে পরিচিত। পশ্চিমা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের বিপরীতে —যা প্রায়শই 'জীববিজ্ঞান' বা 'ইতিহাস'-এর মতো আলাদা আলাদা বিষয়ে বিভক্ত থাকে— আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থা (IKS) হল একটি সামগ্রিক ও অখণ্ড সত্তা; এবং এর যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত সরাসরি সেই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডারের মধ্যেই নিহিত থাকে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যখন কোনো ভাষা হারিয়ে যায়, তখন এই বিশেষায়িত জ্ঞান ব্যবস্থাগুলোকে ধারণকারী সেই 'হার্ড ড্রাইভ'টি কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে বা 'ক্র্যাশ' করে। আর যখন আপনি আদিবাসী ভাষার কোনো শব্দ হারিয়ে ফেলেন, তখন আপনি মূলত সেই জ্ঞানতাত্ত্বিক রক্ষাকবচটিই হারিয়ে ফেলেন— যা পরিবেশের ধ্বংস কিংবা জনগোষ্ঠীর বিভাজন রোধে ঢাল হিসেবে কাজ করে। আমাদের এই অতি-সংযুক্ত যুগে, বহুভাষিকতা কেবল একটি বিশেষায়িত দক্ষতা হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্বমঞ্চের একটি অপরিহার্য ও মৌলিক কার্যগত প্রয়োজনে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশ্বায়ন কেবল ইংরেজি ভাষার প্রসারই ঘটায় না; বরং এটি এমন সব জটিল 'ভাষিক বাস্তুতন্ত্র' সৃষ্টি করে, যেখানে একাধিক ভাষা একে অপরের পাশাপাশি সহাবস্থান করে, প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে একে অপরের সাথে মিশে গিয়ে নতুন রূপ ধারণ করে। একটি বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে, বহুভাষিকতা হল একধরণের 'মানব পুঁজি'। বিশ্বায়িত প্রেক্ষাপটে, এখন আর লক্ষ্য কেবল অন্য কোনো একটি ভাষায় 'নিখুঁত' দক্ষতা অর্জন করা নয়; বরং লক্ষ্য হল 'ভাষিক নমনীয়তা' অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষিক সংকেতের মধ্যে সাবলীলভাবে বিচরণ করার, সাংস্কৃতিক সূক্ষ্ম বিষয়গুলো অনুধাবন করার এবং পারস্পরিক ব্যবধান ঘুচিয়ে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করার সক্ষমতা অর্জন করা।

আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রভাব : ভাষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে 'সঠিক' ব্যাকরণের গণ্ডি পেরিয়ে 'উপযুক্ত' মিথস্ক্রিয়ার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এর মূল কথা হল— এই সত্যটি অনুধাবন করা যে, একটি সংস্কৃতির মূল্যবোধ, স্তরবিন্যাস এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলি প্রকাশের প্রধান মাধ্যমই হল ভাষা। সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা বজায় রাখার অর্থ হল— এই বিষয়টি উপলব্ধি করা যে, আপনি কী বলছেন, তার চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আপনি কীভাবে বলছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের বিষয়টি কেবল 'পাঁচটি' 'F'-এর (Food, Fashion, Famous Person, Festival and Flag) গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রকৃত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ভাষাকে গণ্য করা হয় একটি সংস্কৃতির 'পরিচালনা ব্যবস্থা' হিসেবে; আর সংস্কৃতিকে বিবেচনা করা হয় সেই প্রেক্ষাপট হিসেবে, যা ভাষাকে তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য প্রদান করে।

বিশ্বায়ন প্রায়শই 'শুধুমাত্র ইংরেজি' ভিত্তিক কর্পোরেট পরিবেশকে পুরস্কৃত করে, যার ফলে স্থানীয় সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতা এবং উদ্ভাবন হারিয়ে যেতে পারে। শহরগুলো যত বেশি বিশ্বায়িত হয়, তারা প্রায়শই 'সাংস্কৃতিক সমরূপতা'-র সম্মুখীন হয়। আবার, বৈশ্বিক নাগরিকত্বের প্রসার হল এমন একটি সত্তা বা পরিচয়ের বিকাশের প্রক্রিয়া, যা স্থানীয় বা জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে যায়। এটি এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে— আমাদের সামাজিক, পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বৈশ্বিক প্রভাব রয়েছে; আর তাই, এই গ্রহ এবং এর বৈচিত্র্যময় অধিবাসীদের প্রতি আমাদের একটি সম্মিলিত দায়বদ্ধতা রয়েছে। জাতীয় পরিচয়ের স্থান দখল করার পরিবর্তে, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব সর্বজনীন নৈতিকতা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক নমনীয়তার একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করে। (Block and Cameron, Globalisation and Language Teaching, 2002, p. 69)

UNESCO এর মতে, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা (GCED) শিক্ষার তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে—

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র : বৈশ্বিক বিভিন্ন বিষয় যেমন— জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, অসমতা, এবং বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক ও গভীর বোধ গড়ে তোলা।

সামাজিক-আবেগিক ক্ষেত্র : একটি অভিন্ন মানবসমাজের অংশ হওয়ার অনুভূতি লালন করা, মূল্যবোধ ও দায়িত্বসমূহ ভাগ করে নেওয়া এবং সহমর্মিতা ও সংহতির চর্চা করা।

আচরণগত ক্ষেত্র : একটি অধিকতর শান্তিপূর্ণ ও টেকসই বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয়, জাতীয় এবং বৈশ্বিক— সর্বস্তরে কার্যকর ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা।

একজন বিশ্ব-নাগরিক কেবল ভিন্নতাকে 'সহ্য' করেন না; বরং তিনি সেটির মর্মোদ্ধার করেন। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল ভাষাগত কৌতূহল। আমাদের এই বোধ রাখা যে, ভাষা হল ভিন্ন এক ধরণের যুক্তিবোধে প্রবেশের একটি জানালা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এমনকি প্রাথমিক স্তরের বহুভাষিকতাও 'আমরা বনাম তারা' —এই ধরণের মানসিকতা কমিয়ে দেয়। আজকের দিনে, ডিজিটাল জগতই হল বৈশ্বিক আদান-প্রদানের প্রধান ক্ষেত্র। একজন বৈশ্বিক নাগরিকের মূল বৈশিষ্ট্য হল— 'বৈশ্বিকভাবে চিন্তা করা এবং স্থানীয়ভাবে কাজ করা'-র সক্ষমতা।

আমাদেরকে এমন সব নীতিকে সমর্থন জানানো, যা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোকে (যেমন— মহামারি বা কার্বন নিঃসরণ) বিভিন্ন দেশের মধ্যকার প্রতিযোগিতামূলক সমস্যা হিসেবে না দেখে, বরং সমগ্র মানবজাতির একটি যৌথ সমস্যা হিসেবে গণ্য করে। বৈশ্বিক নাগরিকত্বের ধারণাকে উৎসাহিত করার মূল লক্ষ্য হল এমন একটি বিশ্ব গড়ে তোলা, যেখানে বৈচিত্র্যকে একটি শক্তি হিসেবে এবং পারস্পরিক সংযোগকে সম্মিলিত অস্তিত্ব রক্ষার একটি সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বায়ন এবং অনুবাদ— উভয়ই ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত। এরা সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাগুলোকে দূর করে দেয়। বিশ্বায়ন বিভিন্ন জাতিকে রূপান্তরিত করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সত্তাসমূহ ভাষার মাধ্যমেই একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুমুখী ক্ষেত্রগুলোতে বহু ভিন্নভাষী মানুষ জড়িত থাকা সত্ত্বেও, অনুবাদের অস্তিত্বের কারণেই এই যোগাযোগ অনন্যভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে, অনুবাদকে একটি নীতি এবং একটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে, অনুবাদ বিভিন্ন ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে আগত মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। এই বিশ্বায়িত পৃথিবীতে, অনুবাদ একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। ভাষার ব্যবহারকারীদের মতোই, ভাষারও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতি অনেক কিছু অবদান রাখার আছে। প্রকৃতি ও কার্যকারিতার দিক থেকে, ভাষা জীবনের সর্বক্ষেত্রকে আবৃত করে রাখে।

Nelson Mandela-র মতে, আপনি যদি কোনো মানুষের বোধগম্য কোনো ভাষায় তার সাথে কথা বলেন, তবে তা তার মস্তিষ্কে পৌঁছায়; কিন্তু আপনি যদি তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলেন, তবে তা সরাসরি তার হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছায়।

উপসংহার : উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে সংস্কৃতি এবং ভাষা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। ভাষা সংস্কৃতির একটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে এবং সংস্কৃতির সঞ্চালন ঘটে ভাষার মাধ্যমেই। এই দুটি ধারণার মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য হল— ব্যক্তি ও সমাজ কীভাবে তাদের নিজস্ব সত্তা বা পরিচয় গঠন করে, তা বজায় রাখে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঞ্চারিত করে, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

প্রকৃত যোগাযোগ তখনই সম্ভব হয়, যখন কোনো নির্দিষ্ট ভাষিক প্রতীককে সেই সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ব্যাখ্যা বা পাঠোদ্ধার করা হয়, যে প্রেক্ষাপটে সেটির উদ্ভব ঘটেছিল। ভাষাকে এমন একটি সুশৃঙ্খল ও প্রথাগত ব্যবস্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মানবসমাজে যোগাযোগ স্থাপন এবং আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্যে ধ্বনি, সংকেত কিংবা লিখিত প্রতীকের ব্যবহার করা হয়। ভাষার মূল উদ্দেশ্য হল— অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, চিন্তাভাবনা করা এবং জীবনের প্রতি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান গড়ে তোলার জন্য একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করা।

সুতরাং, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্কটি নিঃসন্দেহে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীল বা সহজীবী সম্পর্ক; কারণ একে অপরকে ছাড়া এদের কোনোটির পক্ষেই কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। বহুভাষী ব্যক্তিরা তাদের ভাষার নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয়কে প্রতিনিয়ত বিন্যস্ত ও সংজ্ঞায়িত করে থাকেন; পাশাপাশি তারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যে, কোনো সংস্কৃতির অভ্যন্তরে ভাষার সংরক্ষণ কিংবা বিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াগুলো কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। (Jha, Language, Culture and Identity analysis of the symbiotic relationship between Language and culture, 2018, p. 4-5).

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ভাষা অর্জন এবং এর বিকাশের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এবং ভাষা হল সংস্কৃতিকে বোঝার মুল চাবিকাঠি। মানুষ জন্মগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট ভাষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না; তবে তারা জন্মসূত্রেই এমন এক সহজাত ভাষাশিক্ষণ-ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি নিয়ে পৃথিবীতে আসে, যা তাদের বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম করে তোলে। যদি ভাষা-নীতি এমনভাবে প্রণীত হয় যা শিক্ষার্থীদের সামাজিকভাবে দক্ষ ভাষা ব্যবহারকারী হিসেবে গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিফলিত করে, তবে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 539 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাশাপাশি তারা অধ্যয়নের জন্য বেছে নেওয়া অন্য যেকোনো ভাষা ও সংস্কৃতিকে— আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। এই ক্ষেত্রটি নিয়ে গবেষণা আমাদের 'অনুবাদ'-এর পর্যায় পেরিয়ে 'সংযোগ'-এর পর্যায়ে উপনীত হতে সহায়তা করে।

Reference:

Barker, C. Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage, 2003.
Block, D. and Cameron, D. Globalisation and Language Teaching. London: Routledge, 2002.
Campbell, L. The Handbook of Linguistics**,** The History of Linguistics**:** The Sapir-Whorf hypothesis. Wiley. 2017.
Chomsky, N. Language and Mind. New York: Harcourt Brace. 1972.
David, E. The Relationship between Language and Culture. 2013.
Jha, Hemant K. "Language, Culture and Identity analysis of the symbiotic relationship between Language and Culture." International Journal of innovations in TESOL and Applied Linguistics, vol.4, no. 2, 2018.
Jiang, Wenying. "The Relationship between Culture and Language." ELT Journal, vol. 54, no. 4, 1 Oct. 2000,
Nida, E. 'Language, culture, and translation.' Foreign Languages Journal 115/3, 1998.
Phillipson, R. Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University Press. 1993.
Sapir, E. Selected Writings in Language, Culture and Personality, ed. D. Mandelbaum, Berkeley. 1949.
Stern, H. H. Fundamental concepts of language teaching. Oxford: Oxford University Press. 2009.
Wardhaugh, R. An introduction to sociolinguistics (Fourth Ed.). Oxford: Blackwell Publishers. 2002.
Tomlinson, J. Globalisation and Culture, Cambridge. 1999.
Whorf, B.L. Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, Ed. J.B. Carroll. New York. 1956.